বুঝতে পারেন রবীন্দ্রানুসরণে বাংলা কাব্যের মুক্তি নেই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' তাই কাব্য হিসেবে অকিঞ্চিৎকর হলেও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম বিশিষ্ট রচনা 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০)। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আধুনিক কবির বিদ্রোহ প্রথম সার্থক রূপ লাভ করলো এই গ্রন্থে। সমস্যা-জর্জর জটিল আধুনিক মননের বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে বুদ্ধদেব লিখলেন 'বন্দীর বন্দনা'। প্রেম-সম্পর্কিত সমস্ত পূর্বধারণা ভেঙে দিয়ে তিনি জীবনের জয়গান করলেন। বুদ্ধদেব প্রধানত প্রেমের কবি, আধুনিক সমস্যাজর্জর ঘটনাবলীর মধ্যেও তিনি প্রেমকেই কাব্যের প্রধান বিষয় করেছেন। কিন্তু রাবীন্দ্রিক অতনু-ভাবনার নিরাবেগ শীতলতার পরিবর্তে তাঁর কবিতায় দেখা যাবে লরেন্সীয় যৌবনবাসনার উদ্দামতা। বুদ্ধদেবের প্রেম শারীরিকতায় অতিমাত্রায় সমাসক্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মনে হলো মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। অথচ কামনার তাপে নিরন্তর দগ্ধ কবি মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, বিধাতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র অভিযোগ :

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী কবি রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম। এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।
প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত তপ্ত নাগপাশে
সৃজন উষার আদি হতে
উদাসীন স্রষ্টা মোর। [বন্দীর বন্দনা]

বুদ্ধদেবের অলজ্জ যৌবন-বাসনা আবেগের প্রচণ্ডতায় প্রাণতপ্ত ও স্পন্দনময় :

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষু মাগে নিতি
তাদের মেটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
হিরন্ময় প্রেম পাত্রে হীন হিংসা সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।

এই যৌবনের দুরন্ত আবেগ বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন লরেন্সের কবিতায় :

But then came another hunger
Very deep, and ravening
The very body's body crying out
With a hunger more frightening, more profound
Than stomach or throat or even the mind;
Rather than death more clamourous—
The hunger for the woman.

[D.H. Lawrence/Manifesto]

শুধু দেহবাদেই যদি বুদ্ধদেব নিমজ্জিত হতেন তাহলে তাঁকে আধুনিক কবিদের পুরোধা বলা যেত না। দেহের কারাগারে বন্দী হয়েও তিনি অমৃত-পিপাসু, মুক্তিপ্রয়াসী। দেহকে

অগ্রাহ্য করে নয়, সাধনার কামকে প্রেমে পরিণত করে তিনি প্রবৃত্তিকে জয় করেছেন, আবিষ্কার করেছেন মুক্তির পথ। কিন্তু এজন্য তিনি বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ নন। কারণ—

তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি সম।
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন সুধা মম।
তুমি যারে সৃজিয়াছো ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়ে করেছি শোধন
এই গর্ব মোর। [বন্দীর বন্দনা]

বুদ্ধদেবের প্রেম সম্পর্কিত আত্মদ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে এখানে। তাঁর প্রথম দিকের সমস্ত কাব্যই প্রেমের আবেগ ও সম্ভোগচেতনায় মুখর। বুদ্ধদেবের মর্ম-মানসী কঙ্কাবতী; রূপকথার জগৎ থেকে তার অভিসার কবির মানসলোকে। প্রিব্যাফেলাইট কবিরা যেমন মধ্যযুগের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিলেন, বুদ্ধদেব তেমনি আধুনিক যুগের কুশ্রীতা থেকে রূপকথার স্বপ্নজগতে ফিরে যেতে চেয়েছেন।

বিশুদ্ধ অন্তঃপ্রেরণার পরিবর্তে কাব্যের নির্মাণ-শিল্পের ওপর বুদ্ধদেব বেশি জোর দিয়েছিলেন। 'দময়ন্তী' রচনার সময় তিনি স্থির করেন লেখার সময় কয়েকটি নিয়ম মেনে চলবেন : যেমন, কথ্যভাষার বাকরীতি ব্যবহার, সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ বর্জন, চলিত শব্দের তৎসম-প্রতিশব্দ পরিহার, উপভাষা এবং কাব্যে ব্যবহৃত নাম ও অব্যয় পদ ত্যাগ এবং প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। সব সময় অবশ্য তিনি তাঁর নিয়ম মেনে চলতে পারেননি। 'দময়ন্তী' আর একটি কারণেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যৌবনপ্রান্তে এসে দময়ন্তীর (১৯৪৩) মধ্যে বুদ্ধদেব প্রেম-সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তাকে প্রকাশ করেছেন। দেহে প্রৌঢ়ত্ব সঞ্চারেও যে তৃষ্ণার শেষ নেই 'তার পরিণতি কি হবে' এই ছিল বুদ্ধদেবের সমস্যা। অবশেষে নিজের অবসিত-যৌবনে আত্মজাকে পুনরুজ্জীবিত দেখে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন এই ভেবে :

যে প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার। [দময়ন্তী]

অবশ্য প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে সন্ধি করে এত সহজে যৌবন ও জরার সমস্যা মেটেনি। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই ভাবতে চেয়েছেন ঋতুচক্রের আবর্তনের মতো আমাদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে যৌবন থেকে জরায়, জরা থেকে যৌবনে। রূপান্তর ও দ্রৌপদীর শাড়ী— এই বিশিষ্ট ভাবনারই প্রকাশ। এর পর কবির চিন্তা আবার মোড় ফিরেছে নতুন দিকে। আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা বুদ্ধদেব এভাবেই আন্দোলনের আপাত-কঠিন দায়িত্ব অর্থাৎ শরীরী প্রেমকে নিষ্ঠুর স্বীকৃতি দানে পূর্বসংস্কার মোচনের কাজ বেশ নিপুণভাবে পালন করে বাংলা কবিতায় প্রেম-সম্পর্কিত অন্ধ-গোঁড়ামিকে চির নির্মূল করেছেন। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

জীবনানন্দ দাশ

আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি জীবনানন্দ দাশ। মননের ধর্ম, ভাবের গভীরতায়, ইন্দ্রিয়-ঘন চিত্র-রূপায়নে রবীন্দ্রনাথের পরে আর কোন কবি এত অভিনিবেশ দাবি করেননি। আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের ভাঙাগড়ায় কিছুমাত্র অংশগ্রহণ না করেও তিনি আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিপন্ন হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায় তিনি "প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।" সময়ের দিক থেকে জীবনানন্দ বুদ্ধদেবের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবেশ করেছেন বুদ্ধদেবের কিছু পরে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্র দত্ত এবং নজরুলের অনুসরণে তিনি লিখেছিলেন 'ঝরাপালক' (১৯২৮) এবং বুদ্ধদেবের মতোই বুঝেছিলেন রবীন্দ্রানুসরণে বাংলা কাব্যের মুক্তি নেই। এর কয়েক বছর পরে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে (১৯৩৬) জীবনানন্দ আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন :

"একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোন এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন
আর নাই কেউ!
আমার পায়ের শব্দ শোনো
নতুন এ,—আর সব হারানো—পুরানো। [কয়েকটি লাইন]

জীবনানন্দের আবির্ভাবে নতুনত্ব থাকলেও তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি এবং তিনি নির্জনতার কবি-রূপেই পরিচিত। নতুন কবিদের সদা-লব্ধ যৌবনের কলকণ্ঠের পাশে তাঁর মৃদুভাষণ সহসা শোনা যায় না, কিন্তু আধুনিক যুগের সংশয়ী মানবের শোণিতাক্ত হৃদয়ের উষ্ণ-স্পন্দন তাঁর কবিতাতেই সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তি ও জটিলতা জীবনানন্দের আপাত সরল কবিতাগুলির পংক্তিতে লুকিয়ে আছে। সেজন্য তাঁর কবিতা যতখানি সুখপাঠ্য ততখানি সহজবোধ্য নয়। আধুনিক মনের সংশয়, পুরোনো জীবনের মূল্যবোধ হারানোর বেদনা, নাগরিক জীবনের গ্লানি, যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির ক্লান্তিবোধ, ভবিষ্যতের আশাহীন-শূন্যতা— জীবনানন্দের প্রাতিস্বিক চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে কবিতায় বর্ণ-নিষেক করেছে। তাই তাঁর কবিতায় বুদ্ধির চেয়ে বোধের প্রাধান্য বেশি।

এলিয়টের প্রতীককে (Waste land) তিনি নিয়ে এলেন হেমন্তের শস্যরিক্ত মাঠে। হেমন্তের নিঃস্ব রিক্ত-অনুর্বর বিষণ্ণ রূপ সৃষ্টি-সম্ভাবনাহীন বর্তমান যুগেরই প্রতিবিম্ব। প্রতীকের প্রয়োগে প্রথমেই তাঁর আশ্চর্য কুশলতা দেখা গেল। প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতা ও প্রেমের দ্বন্দ্বে বুদ্ধদেবকে যেভাবে চিন্তা করতে হয়েছিল, জীবনানন্দ সেভাবে চিন্তা করেননি। তাঁর মনে স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোন এক বোধ কাজ করে। তাই ভালবাসাকে তিনি সহজেই অতিক্রম করতে পারেন, নারী-সম্পর্কিত ভাবনাতেও তিনি যেন উদাসীন ঃ

ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষের,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

না, কোথাও তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করছেন না। তবু "পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ" তাঁর কাম্য নয়। বরং

"করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব। [বোধ]

পার্থিব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতাকে তিনি বোধের জগতে স্থান দিয়েছেন। কারণ রোম্যান্টিক ভাবনার স্বপ্নময়তা এখন অবসিত, বহু-ব্যবহারে মলিন :

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ,
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত— [আদিম দেবতারা]

বাংলা কবিতায় এই শব্দ-বিন্যাস, প্রতীক— ভাবনা, রূপ-নির্মিতি অভাবনীয়। মানসিকতার দিক থেকে জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েটস্-এর মনোভাবের নিগূঢ় আত্মীয়তা চোখে পড়ে। "The Scholar" কবিতার সঙ্গে 'সমারূঢ়', "The White Bird"-এর সঙ্গে 'আমি যদি হতাম', কিংবা "The Falling Of The Leaves"-এর সঙ্গে 'মৃত্যুর আগে'র তুলনা করলেই এ সত্য ধরা পড়বে।

জীবনানন্দের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য 'বনলতা সেন'। নাম-কবিতাটিতে প্রেমিকার দেহী-রূপকে মূর্ত করে তোলা হলো প্রগাঢ় ইতিহাস-চেতনা দিয়ে। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে যে বনলতা সেন কবিকে আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছিল, তার চুলে বিদিশার নিশা আর মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য। হাজার বছর শুধু খেলা করতেও কবি ইতিহাসসচেতন। কবিতাটি প্রথমে বনলতা সেন পর্যায়ের কবিতা ছিল না, মিশর এবং মমির উল্লেখে কবিতাটিকে ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে কবি মিশর এবং মমি শব্দ বর্জন করেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনার পরিচায়ক। অতীতচেতনার মতোই জীবনানন্দ মৃত্যু-সচেতন, মৃত্যু তো অতীতেরই নামান্তর। বহু কবিতায়, বিশেষত 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় আমরা জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনার আভাস পাই। সর্ব- ইন্দ্রিয় দিয়ে মৃত্যু অনুভবের একাধিক চিত্র আছে রূপসী বাংলায়। সেখানে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের সীমাস্পর্শী মৃত্যু তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ানুভবের মতোই প্রত্যক্ষ এবং কাম্য।

যুদ্ধকালীন হতাশা ও বিষাদ এবং মূল্যবোধের সার্বিক বিনষ্টি 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমিরে' প্রতিফলিত। এসময় তিনি কিছুটা প্রতীকধর্মী পরাবাস্তব রীতি প্রয়োগেও অকুণ্ঠ। বাংলা কবিতার জগৎকে জীবনানন্দ এভাবে প্রসারিত করলেন। তাঁর মৌল-সমস্যা একটিই— জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যের অন্বেষণ এবং কবিতায় তার সার্থক রূপায়ন। কিন্তু অতীত যেমন তাঁর উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠেছিল, ভবিষ্যতের বর্তমানত্ব সে তুলনায় নিষ্প্রভ, এই অপূর্ণতা জীবনানন্দের পরম সার্থকতার পথে, চরম সত্যোপলব্ধির পথে চির অন্তরায় হয়ে রইল। এজন্য তাঁর কাব্যে বিষাদ এত বেশি, হতাশা করুণতা এত প্রবল। প্রত্যয়ের গভীরে প্রবেশের জন্য জীবনানন্দ নতুন করে প্রস্তুত হয়েছেন 'বেলা অবেলা কালবেলার' সময়ে এসে। চিন্তার দুরূহতা, নৈর্ব্যক্তিক সত্যানুসন্ধান ও আধুনিক মনের গহন জটিলতাকে

সার্থক রূপ দান করে জীবনানন্দ পরোক্ষে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগের যন্ত্রণাকে নিপুণভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জীবনানন্দের কবিতাকে যদি অনুভূতিপ্রসূত বলা যায় তবে সুধীন দত্তের কবিতা বুদ্ধিগত। তার মধ্যে বিজ্ঞতা আছে, যুক্তি আছে কিন্তু শান্তি নেই। নৈরাশ্যপীড়িত নিঃসীম শূন্যতাবোধ সুধীন্দ্রীয় চেতনাকে সর্বদা ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর ক্ষণবাদী নাস্তিক জীবনদর্শন আধুনিক বাংলা কবিতাতেও অভিনব। জীবনানন্দ সত্যান্বেষণ করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, আবেগ-বর্জহীন প্রজ্ঞাকে। তাঁর উপলব্ধির শেষ কথা :

জীবনের সার কথা শিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী। [নরক]

জীবন ছলনা দিয়ে ভোলায় বলে কবি তাকেও ঘৃণা করেন। অথচ তাঁর অভীষ্ট চির-অপ্রাপণীয়। কারণ জগৎ চলেছে ছলন্ত বাসনার বলে, নিরাসক্ত নিরঞ্জন বুদ্ধির শক্তিতে নয়। ব্যর্থ নৈরাশ্যে তাকেই স্বীকার করতে হয়েছে ভাগ্য বলে :

নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাষ্ময় জগৎ ;
নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় ছলন্ত হৃদয় ;
হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয় ;
জনম হতে জন্মান্তরে সংক্রামিত প্রত্ন-মনোরথ॥
কপোল কল্পনা ত্যাগ, নিরাসক্তি অসাধ্য সাধন ;
অনন্ত প্রস্থান মিথ্যা ; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই ; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন পুনরালিঙ্গন॥" [সৃষ্টিরহস্য]

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, এই বুদ্ধিপ্রসূত বৈরাগ্যের সমাপ্তি বন্ধ্যাতে। জীবনকে দেবার মতো কিছুই নেই, তাই সুধীন্দ্রনাথ নাস্তিক। ঈশ্বর-প্রেম-জীবন-সমাজ-রাজনীতি কোন কিছুর স্থায়িত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই। চির-অবিশ্বাস নিয়ে রোম্যান্টিক-বিরোধী সুধীন্দ্রনাথ একাকী চলেছেন নিঃসঙ্গ শূন্যতার মাঝখানে। এ পথে তিনি অনন্য।

অথচ বুদ্ধদেব-জীবনানন্দের মতো রবীন্দ্রানুশীলন দিয়েই তাঁর কবি-জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং কাব্যচর্চার গোড়াতেই তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা যেমন দুঃসাধ্য, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগে তেমনি রয়েছে এক সমুদ্র ব্যবধান। তবু তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। কারণ তাঁর স্বভাবেই ছিল রবীন্দ্রভাবের বৈপরীত্য। প্রথম থেকেই তিনি সচেতনভাবে ধ্রুপদী আঙ্গিকে কাব্যানুশীলনে ব্যাপৃত হন, অতি ব্যবহৃত রোম্যান্টিক তরলতার প্রতি বিতৃষ্ণাই এর কারণ। তবে সুধীন্দ্রনাথের মননশীল সচেতনতার সঙ্গে ক্লাসিক দার্ঢ্য বেশ খাপ খেয়ে গেছে। প্রকরণের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ ফরাসী রীতির সহমর্মী। মালার্মে এবং পল ভালেরির সঙ্গে তার আন্তর-যোগ। সবুজপত্রে-র সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করার সময় তিনি প্রাথমিক আভিজাত্যের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। তাঁর কাব্যবন্ধের

ঋজুতা ও যুক্তিনির্ভর বাগানুক্রম হয়তো প্রমথনাথেরই দান। তবে মালার্মে-ভালেরি বা প্রমথ চৌধুরী যার প্রভাবই থাক, কবিতার সর্বত্র সুধীন্দ্রনাথের নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকে গ্রুস্ত এবং হাইনের সঙ্গেও সুধীন্দ্রনাথের সহমর্মিতা লক্ষ্য করেছেন, এলিয়টকেও তিনি অতিমাত্রায় স্মরণ করেছেন। সুতরাং প্রভাবের দিকটাই বড়ো নয়, প্রধান হচ্ছে তাঁর নিজস্ব দর্শন। প্রচলিত ভগবান বা আনুষ্ঠানিক ধর্মে সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। নীতি-ন্যায়-মঙ্গলের আদর্শ তাঁর কাছে মূল্যহীন, ভগবানও নন মঙ্গলের প্রতীক :

হায় ভগবান,
হায়, হায়, ব্যর্থ ভগবান,
তোমার অমিত ক্ষমা সে কি শুধু অসুরের তরে ? [প্রশ্ন]

তাঁর প্রশ্ন :

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই ;
নেই তুমি যথার্থ কি নেই ;
তুমি কি সত্যই
আয়ণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ? [প্রশ্ন]

অবশ্য যে দুটি গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ নিখিল নাস্তির দর্শন থেকে অস্তিত্ববাদী হয়েছিলেন, কিন্তু সে গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে অনেক পরে। আমাদের আলোচ্য কালসীমায় তিনি নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারের মধ্যে ক্ষণকালের মুগ্ধ অবকাশে ক্রৈব্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তাই তাঁর প্রেমচেতনায় এই ক্ষণবাদই প্রধান কথা।

আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ প্রেমের চিরন্তনত্বে অবিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথের ক্ষণবাদে এই বৈশিষ্ট্যটি বারবার ধরা পড়েছে। শাশ্বত প্রেম নয়, ভোগবিলাসের ক্ষণমন্দির দৈহিক তৃপ্তিই সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। প্রেমের ইন্দ্রজালে দেহকে তিনি অস্বীকার করেননি :

আমার মনে আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।
প্রাক্-পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে। [প্রতিদান]

পুনরায়—

আজিকে দেহের পালা ; রিক্ত শেজে তাই ভাবি
হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি। [দ্বন্দ্ব]

সুধীন্দ্র কাব্যের নায়িকা বিদেশিনী অনামিকা এবং বহুভোগিণী। অপরাজিতার মতো নীল নয়ন এবং ধান্যসম উডবীন কেশ নিয়ে এই বিদেশিনী কবির স্মৃতিতে সদা-জাগরূক। তার ক্ষণিক প্রেম মিলনযজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। কবি জানেন তাঁর অন্তর্ধানের পরে—

"স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে
বসন্ত অন্তরে তব আরম্ভিবে পুণঃ চতুরালি ;
নবীন ফাল্গুনী আসি হানা দিবে রুদ্ধ দ্বারদেশে
ফলিবে মানসক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে সোনার চৈতালী। [ভবিতব্য]

দার্শনিকের মতো তিনি বলেন : "তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয়"। তবু এ ক্ষণিকের মিলন মিথ্যে নয়—

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,

স্থান পাবে হে ক্ষণিকা, শ্লথমন্থরী যৌবন তোমার :
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে। [হৈমন্তী]

কিন্তু, বুদ্ধি দিয়ে সব জানার পরেও তাঁর হৃদয় আশ্রয় খোঁজে প্রেমের মধ্যে, ক্ষুব্ধ স্মৃতিভারাতুর কবি অসহ্য বর্তমান ও অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে খুঁজেছেন অনামিকাকে :

তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম। [নাম]

আধুনিক যুগের ট্রাজেডি, ব্যক্তিমানুষের মর্মান্তিক বেদনাকে সুধীন্দ্রনাথ মিথ্যা আশ্বাসে সহনীয় করার চেষ্টা করেননি। বরং নিষ্ঠুরতম সত্যোপলব্ধির অকপট প্রকাশে আধুনিক কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বুদ্ধদেবের আবেগ ও জীবনানন্দের রহস্যময়তাকে দৃঢ়মূল ভিত্তি দেবার জন্য আধুনিক কাব্য আন্দোলনে আত্যন্তিক প্রয়োজন ছিল সুধীন্দ্রনাথের নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনার।

বিষ্ণু দে

অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো বিষ্ণু দেরও প্রথম এবং প্রধান সমস্যা রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হবার সমস্যা। তবে তিনি কোন সময়েই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেননি এবং সচেতনভাবে রবীন্দ্র-কবিতার পংক্তি নিজের কবিতায় যথেচ্ছ ব্যবহার করে তিনি রবীন্দ্রকাল ও স্বকালের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। প্রথম দিকে এই পংক্তি ব্যবহারে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি মিশে ছিল :

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ।
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে উচ্ছ্বসি
সুবেশ শুধু কাম দেখি গুলকোজ। [কথকথা]

এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এলিয়টের 'The Love Song of J. Alfred Prufrock'-এর। পরবর্তীকালে অবশ্য রবীন্দ্র-কবিতার প্রতি কবির এই ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসংশয়িত বিশ্বাস স্থাপনের ফলে নিজের কবিতায় রবীন্দ্র-কবিতার চরণ ব্যবহারও নতুন দিকে মোড় ফিরেছে :

তোমার প্রয়াণে
যৌবন বেদনাভরে উচ্ছল তোমার দিনগুলি
রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ
আমার প্রাণের পাত্রে [জঙ্গী]

বিষ্ণু দে কবিতার সীমা বাড়িয়েছেন স্থান ও কালের প্রসারে। ইতিপূর্বে ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যই বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু বিষ্ণু দে স্পেন-রাশিয়া-চীন-আমেরিকার কবিদেরও অনুসরণ করেছেন। স্থানের মতো কালের প্রসারও হয়েছে অর্জুনের সঙ্গে হ্যামলেটের প্রতীক, উর্বশীর সঙ্গে আর্টেমিসের চিত্রকল্প গ্রহণে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। শুধু সাহিত্য নয়, শিল্প-সংগীত-চিত্র-বিজ্ঞান এমন কি রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতাতেই প্রথম রাজনীতির সচেতন প্রবেশ চোখে পড়ে।

মননের দিক থেকে বিষ্ণু দে কখনো এলিয়টের শিষ্য, কখনো এলুয়ার-আরগঁর সমমর্মী। বিভিন্ন প্রভাবের সমন্বয়ে এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বহুমুখী-সত্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিষ্ণু দে আধুনিক যুগের জটিলতম কবি। তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা এবং অসংলগ্নতা সর্বজনবিদিত। এর প্রধান কারণ কবিতায় নিজের বক্তব্যকে তিনি ধারাবাহিকভাবে সাজাতে ইচ্ছুক নন। যুগের দ্বিধা-জর্জর মানসিকতা ও চিন্তার অসংলগ্নতাকে তিনি এভাবেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতার স্বভাবই তাঁকে সরল থাকতে দেয়নি। যেমন ধরা যাক তাঁর 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতার কথা। বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত স্বীকার করেছেন কবিতা দুটির ভাব তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। এখানে রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ এবং বিগত-মোহ প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য কবিদের ধারণার সঙ্গে বিষ্ণু দের পার্থক্য বোঝা যায়। ইতিপূর্বে নিষ্ঠাবতী নায়িকাদের জয়গান করা হত, বিষ্ণু দে যাঁদের কথা লিখলেন তাঁরা প্রেমের বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। সুধীন দত্তের ভাষায় বলা যায় ওফেলিয়া ও ক্রেসিডা কোনো 'প্রকৃতি-কৃপণা পার্থিবা নন, সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক''। এলিয়টিয় রীতিতে লেখা এই কবিতা দুটি নতুন প্রেমাদর্শ স্থাপন করেছে। সুধীন দত্তের মতো বিষ্ণু দে-ও প্রেমের ক্ষণিকতায় বিশ্বাসী। তবে তাঁর স্মৃতি মানবের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে না। বরং নতুন সম্ভবনার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কবিতায় ট্রয়লাস ক্রেসিডাকে স্মরণ করেছে কিন্তু থেমে যায়নি—

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে।
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান খান।" [ক্রেসিডা]

বিষ্ণু দে অস্তিবাদী কবি। সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে এই বিশ্বাস তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। ব্যষ্টি নয়, সমষ্টির চিন্তাই তাঁকে ভাবিত করেছে। মার্কস্-পন্থার মধ্যে তিনি সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন—তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ কোন কিছুই তাঁকে অমিয় চক্রবর্তীর মতো বেদনামথিত করেনি, এদের মধ্যেই তিনি বিপ্লবের সূচনা দেখেছেন। রূপকথার প্রতীকের মধ্যেও তাঁর এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যে সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্র ধ্বংসের আভাস আছে 'মৌভোগ' কবিতায়—

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল জাগে,
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙ্গা, উষার রক্তরাগে
কার এসেছে কাল ?

বিষ্ণু দে-র জটিল মানসিকতার সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন হয়েছে 'জল দাও' কবিতায়। এটি তাঁর বিখ্যাত কবিতার অন্যতম। আঙ্গিক-প্রকরণের চেয়েও চিন্তার দিক থেকে কবিতাটি অভিনিবেশ দাবি করে। পৃথিবীর কাছে যিনি প্রকৃতি, কবির কাছে তিনিই প্রেম ; উভয়ের মধ্যেই আছে সঞ্জীবনী শক্তির আশ্বাস। সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রক্ষেপ সত্ত্বেও নায়কের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে কবিতাটি চিরকালের হয়ে উঠেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা করবার সময় মন্তব্য করেছেন : "দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক হঠবাদ আত্যন্তিক শোচনীয়তা এবং সার্বত্রিক হতাশার ভিতর দিয়ে একটি বিশুদ্ধির দিকে অবিরাম-যাত্রার প্রেরণাই এ কবিতার বিষয়।"

নির্দিষ্ট কালখণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তির বোঝাপড়া এবং প্রতি মুহূর্তেও অত্যাচার-অনাচারকে উপেক্ষা করে যন্ত্রণাদগ্ধ রক্তাক্ত পথের ওপর দিয়ে অমল মহিমার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির যাত্রাই